আশ্বিনের শারদপ্রাতে

ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষার ব্যবধান, সামাজিক প্রথার বিপুল বৈচিত্র, সব পেরিয়ে ধর্ম আর সংস্কৃতি ভারতকে বরাবর একটা সংহতি দিয়েছে। মহালয়া থেকে নবরাত্রি, শারদোত্সবের এই মরসুমেও তার নিদর্শন মেলে।

জহর সরকার

১১ অক্টোবর, ২০১৫, ০০:০২:০০

ইতিহাস। মহালয়ার ভোরবেলায় আকাশবাণীতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

সবচেয়ে তর্কবাগীশ বাঙালিটিও নিশ্চয় মানবেন, মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ এক বিরল অনুষ্ঠান, যা আমাদের সাংস্কৃতিক অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে চলেছে। ১৯৩২-এ যখন মহিষাসুরমর্দিনী শুরু হয়, আকাশবাণীর তখনকার প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বোধ করি ভাবতেও পারেননি, এ অনুষ্ঠান এতটা সফল হতে চলেছে। আকাশবাণীতে যাঁদের সিরিয়াস আড্ডা থেকে এই অনুষ্ঠানের ভাবনাটা এসেছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার,

‘গল্পদাদু’ যোগেশ বসু, রাইচাঁদ বড়াল এবং অবশ্যই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রখ্যাত শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আবেগমথিত কণ্ঠে সংস্কৃত শ্লোক, তার মাঝে মাঝে অসুরনিধনের ইতিবৃত্ত, সঙ্গে অনবদ্য সুরের গান, অসাধারণ আবহসংগীত, শঙ্খধ্বনি, সব মিলিয়ে মহিষাসুরমর্দিনী অনন্য হয়ে উঠেছে।

প্রথম ক’বছর এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হত ষষ্ঠীর সকালে। কিন্তু ভ্রমণবিলাসী বাঙালি যেহেতু পুজোর সময় বেড়াতে চলে যায়, তাই এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় হিসেবে মহালয়ার ভোরকেই বেছে নেওয়া হল। দেবীপক্ষ শুরুর আগেই এই অনুষ্ঠান সেরে ফেলা নিয়ে পণ্ডিতমশাইরা অবশ্য অখুশি ছিলেন। প্রথমে প্রতি বছর অনুষ্ঠান লাইভ সম্প্রচার হত। এখন আমরা যে অনুষ্ঠান শুনি, সেটি ১৯৬৬ সালে সম্পাদনা করা। মাঝে এক বার উত্তমকুমারকে ঘোষকের ভূমিকায় রেখে অন্য এক মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মানুষ তা মেনে নেয়নি। টেলিভিশনের প্রসারের পরে সিনেমার অভিনেত্রীদের ভয়ঙ্কর ত্রিশূল হাতে টিভির পর্দা জুড়ে অসুরের পিছনে দৌড়তেও বিস্তর দেখা গিয়েছে, কিন্তু কোনওটাই সফল হয়নি। আকাশবাণী কোনও অজ্ঞাত কারণে এই অনুষ্ঠানের স্বত্ব বিক্রি করে দেয়। এর পর থেকে রেকর্ড, ক্যাসেট, এখন তো ইন্টারনেটেও ইচ্ছে করলেই মহিষাসুরমর্দিনী শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু মহালয়ার কাকভোরে উঠে আকাশবাণীতে এই অনুষ্ঠান শোনার কোনও বিকল্প নেই।

মহালয়া মানে পিতৃপক্ষের শেষ। পিতৃপক্ষ হল সেই সময়, যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মারা পিতৃলোক থেকে নেমে আসেন এবং ভূতপ্রেতদের সঙ্গে মর্ত্যলোকে ঘুরে বেড়ান। এমনকী ইংরেজরাও এ কথা জেনেছিলেন।

প্রায় একশো বছর আগে এম এম আন্ডারহিল সাহেব লিখেছিলেন, ‘সূর্য এই সময় কন্যা রাশিতে অবস্থান করে... আত্মারা যমের বাড়ি ছেড়ে মর্তে নেমে এসে নিজের নিজের বংশধরদের গৃহে অবস্থান করেন।’ ১৯১৭ সালে সি এইচ বাক-এর একটি রিপোর্টে দেখি, ‘বছরে যতগুলি অমাবস্যা আছে, তার মধ্যে মহালয়া, মানে আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশ বা শেষ দিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’ এই দিন লক্ষ লক্ষ পুত্র-পৌত্ররা গঙ্গায় বা অন্য নানা নদীতে, সমুদ্রে, এমনকী পুকুরে নেমে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করেন। তবে পূর্বপুরুষদের জলদান বা পুজো করার রেওয়াজ হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত নয়। প্রাচীন রোমানরা ন’দিন ধরে ‘পারেন্তালিয়া’ বা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতেন। মিশরীয়রা তো মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি রকমের ভাবিত ছিলেন, মৃতদের উদ্দেশে নিবেদিত তাঁদের বিশেষ গ্রন্থও রয়েছে। ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা প্রতি বছর ২ নভেম্বর, ‘অল সোলস ডে’-তে পূর্বপুরুষদের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান। মেক্সিকোর খ্রিস্টানরা পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বর্ণাঢ্য মিছিল করেন। সেই মিছিলে অনেকে কঙ্কাল বা ভূত সাজে। ফিলিপিন্স-এ আবার এই উৎসবের নাম ‘হ্যালোমাস’। মায়ানমারেও এ রকমই একটা পুরনো প্রথা রয়েছে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের থেকে বাঙালির উৎসব আর রাজনীতি সাধারণত বেশ আলাদা, কিন্তু নবরাত্রির ক্ষেত্রে মা দুর্গার অকালবোধনের গল্প নিয়ে সারা ভারত একমত। সবাই মেনে নিয়েছে যে, রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর আগে অসময়ে দুর্গাপুজো করেছিলেন। (আদি নবরাত্রি উৎসব কিন্তু ছিল বসন্তকালে, চৈত্র মাসে।) বাঙালি কব্জি ডুবিয়ে মাছ-মাংস খেলেও ভারতের বহু অঞ্চলে মানুষ এ সময় কঠোর ভাবে নিরামিষাশী থাকেন। সে সব জায়গায় নবরাত্রি পালনের একটা জরুরি

অঙ্গ হল উপবাস। অনেক কট্টর পরিবারে ভাত-রুটি, ময়দা, সুজি, এ সবও খাওয়া চলে না। মশলাপাতির ব্যাপারেও কঠোর নিয়ম রয়েছে: জিরে, ধনে, এলাচ, জোয়ান, পুদিনা, কাঁচা লঙ্কা, আমচুর আর আদা ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবহার নিষিদ্ধ। তরিতরকারি আর ফলমূলেও বাধানিষেধ আছে। রান্নায় দেওয়া চলবে না ডাল, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, হিংও।
অন্য দিকে, নবরাত্রির সময়েই কিছু কিছু এলাকায় বলিদান প্রথা পালিত হয়। রাজস্থানের রাজপুতরা এবং দেশের অনেক রাজপরিবার আর যোদ্ধা-গোষ্ঠীও কুলদেবীর কাছে মোষ বা ছাগল বলি দেন। হিমালয়ের পাদদেশে এবং পূর্ব ভারতে অনেক জায়গায় মোষ বলি প্রচলিত। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বলিপ্রদত্ত প্রাণীর কানে গায়ত্রী মন্ত্র বলেন, যাতে সেই প্রাণীটি পরজন্মের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পায়। প্রসঙ্গত, ইসলাম ধর্মের মানুষের ইদ-উল-জুহায় কুরবানির আগেও একই রকম রীতি অনুসৃত হয়।
নিরামিষ খেয়েই হোক আর বলি দিয়েই হোক, নবরাত্রি উত্সবের একটা বড় উদ্দেশ্য হল সুফসলের প্রার্থনা। মহারাষ্ট্রে এই উৎসব পালন করা হয় ঘট-স্থাপনা উৎসবের মধ্যে। চার পাশে এক তাল মাটির মধ্যে একটি জলপূর্ণ মাটির কলসি স্থাপন করা হয়। সেই মাটিতে হরেক শস্যদানা ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে এই ন'দিনে তারা অঙ্কুরিত হয়। ঘট-স্থাপনার এই পুরো উদ্যাপন যে একটা উর্বরতা এবং উৎপাদনের ধারণা থেকেই এসেছে, তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন দেখি, গুজরাতিরা এই অনুষ্ঠানকে 'গরবা' বা গর্ভ নাম দেন। তাঁদের প্রসিদ্ধ 'গরবা' নাচও হয় এই মাটির কলসিকে ঘিরেই। সেই কলসির মধ্যে একটা প্রদীপও জ্বালানো থাকে। ডান্ডিয়া-রাস উৎসবের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'গরবা' অবশ্য পরে তার আদি রূপ থেকে খানিকটা সরে এসেছে। অন্যান্য অনেক জায়গায় যাগযজ্ঞ করে আর বিশেষ 'সোনালি পাতা' দিয়ে এই ঘটের পূজা হয়। গোয়ায় এই পাত্র

সাধারণত তামা দিয়ে তৈরি হয় এবং এই সময়েই নানান গোষ্ঠীর মানুষ শস্য রোপণের উত্সব করেন।
দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে এই উৎসবের সময় একটা অদ্ভুত প্রথা চলে। কাঠের পাটাতনের ওপর ছোট্ট ছোট্ট কাঠের পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়। একে অনেক জায়গায় 'বোম্মাই কুলা' বা ওই গোছের নানা নাম দেওয়া হয়েছে। এই পুতুলের সারি দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় প্রাত্যহিক জীবনের নানা ছবি, আবার তার পাশাপাশি সরস্বতী, পার্বতী এবং লক্ষ্মীর মূর্তিও থাকে। অন্ধ্রপ্রদেশে আর মহীশূরে এই উৎসব পালন করা হয় পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়ের উদ্‌যাপনের লগ্ন। সুতরাং আমরা নবরাত্রি পালন করার অনেক রকম কারণ পেলাম।
কিন্তু ধর্মীয় উৎসব বিষয়ে আমরা যত বেশি জানার চেষ্টা করি, ততই একটা ব্যাপার দেখতে পাই। ভূগোল এবং ভৌগোলিক দূরত্ব আচার-ব্যহার আর ভাষার বৈচিত্রের মাধ্যমে যত বিভিন্নতাই তৈরি করুক না কেন, ধর্ম আর সংস্কৃতি ভারতকে বরাবর একটা সংহতি দিতে পেরেছে।